রবিবার, ১৯ শ্রাবণ, ১৪২৫
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ২১৯

ভালো নেই অপঞ্জিভূক্ত অসমবাসীরা। প্রতিটি দিন কাটাচ্ছেন ভয়ঙ্কর আতঙ্কে

অসমে এখন অনেকের হাতেই ঘুরছে নাগরিক পঞ্জির ফর্ম। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন অসমের নাগরিক পঞ্জিতে নাম না থাকা অসংখ্য মানুষ। অনেকের আবার নিজের ও ছেলের নাম উঠলেও নেই স্ত্রী'র নাম। হন্যে হয়ে দৌড়চ্ছেন তাঁরা ফর্ম ফিলাপের জন্য। সরকার অবশ্য চলতি মাসের ২৮ তারিখ পর্যন্ত নাগরিক পঞ্জিতে উপযুক্ত প্রমাণ সহ নাম নথিভূক্ত করার সময়সীমা দিয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে প্রচ্ছন্ন হুমকি। যেসব পরিবার নাগরিক পঞ্জির আওতাভূক্ত, অভিযোগ আসছে, তাঁরা নাকি আড়ালে আবডালে, কখনও প্রকাশ্যেই হুমকি দিচ্ছে পঞ্জিতে নাম না থাকারা এবার যেন বাক্স-প্যাটরা গুছিয়ে ফেলে। অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, অসমের ডিনেটশন ক্যাম্পগুলির যা অবস্থা দাঁড়াচ্ছে তা যেন ক্রমেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন অপঞ্জিভূক্ত মানুষরা। কিন্তু সবথেকে খারাপ অবস্থায় রয়েছেন, পরিবারের কিছু সদস্যের নাম আছে, অথচ কেউ কেউ বাদ পড়ে গেছেন, এই ধরনের পরিবারগুলি। তাঁরা ভয় পাচ্ছেন এই ভেবে যে, শেষ পর্যন্ত প্রিয়জনদের হারাতে হবে না তো? জীবিকা, বাড়ি, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে না তো অন্যত্র? তবে অসমবাসীর একটাই বক্তব্য, ৪০ লক্ষের নাম নেই নাগরিক পঞ্জিতে। এরপরেও আমাদের যদি কেউ বলে, আতঙ্কের কিছু নেই, সেটা কী করে সম্ভব? ডিটেনশান ক্যাম্পগুলিই বা এতো মানুষের জায়গা দেবে কী করে? যদি ডিটেনশান ক্যাম্প প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার আরও ডিটেনশান ক্যাম্প তৈরি না করে এভাবে তাঁদের ভবিষ্যৎকে অথৈ জলে কেন ফেলছেন? তবে সবমিলিয়ে ভালো নেই অপঞ্জিভূক্ত অসমবাসীরা। প্রতিটি দিন কাটাচ্ছেন ভয়ঙ্কর আতঙ্কে। এর থেকে পরিত্রাণ কোথায়, ভেবে পাচ্ছেন না তাঁরা।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

একদিন কেশববাবুর সহিত কথা হইতেছিল—

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)— মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত! আমি মুক্ত পুরুষ— সংসারেই থাকি, আর অরণ্যেই থাকি—আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে, আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায়,—বিষ নাই, বিষ নাই; জোর ক'রে বললে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনিই 'আমি বদ্ধ নই' 'আমি বদ্ধ নই' 'আমি মুক্ত' এই কথাটি রোক ক'রে বলতে বলতে তাই হ'য়ে যায়। মুক্তই হ'য়ে যায়।

‘‘খৃষ্টানদের একখানা বই (বাইবেল) একজন দিলে। আমি প'ড়ে শুনাতে বললাম। তাতে কেবল 'পাপ' আর পাপ'। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' বারবার বলে, সে শেষে বদ্ধই হ'য়ে যায়। যে রাতদিন 'আমি পাপি' 'আমি পাপি' এই করে, সে তাই হয়ে যায়।”

'ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই— কি! আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে? আমার আবার বন্ধন কি, পাপ কি? কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সে বৃন্দাবনে গিয়েছিল। একদিন ভ্রমণ করতে করতে জল তৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখলে, একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বললে, 'ওরে তুই আমায় এক ঘটি জল দিতে পারিস? তুই কি জাত?' সে বললে, 'ঠাকুর মশাই, আমি হীন জাত— মুচি।' কৃষ্ণকিশোর বললে, **'তুই বল, শিব, আর ল তুলে দে।'**

ভগবানের নাম করলে দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়। কেবল 'পাপ' আর 'নরক' এ সব কথা কেন? একবার বল যে অন্যায় কর্ম যা করেছি, তা আর করবো না। আর তাঁহার নামে বিশ্বাস কর। স্বামীজীও খৃষ্টানদের এই পাপবাদ সম্বন্ধে বলিলেন, পাপী কি!

দিনপঞ্জিকা

১৯ শ্রাবণ, ভাঃ ১৪ শ্রাবণ, **৫ আগস্ট,** ১৯ শাওন, সংবৎ ৮/৯ শ্রাবণ বদি, ২২ জেল্কদ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১২, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৫। **রবিবার,** অষ্টমী দিবা ঘ ৬/৩২ পরে নবমী শেষরাত্রি ঘ ৫/১১ মিঃ। ভরণীরক্ষত্র দিবা ঘ ১১।২৩ মিঃ। গণ্ডযোগ দিবা ঘ ৯।১ মিঃ। কৌলবকরণ দিবা ঘ ৬।৩২ গতে তৈতিলকরণ, সন্ধ্যা ঘ ৫।৫১ গতে গরকরণ, শেষরাত্রি ঘ ৫।১১ গতে বণিজকরণ। **জন্মে**-- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ঘ ১১।২৩ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, অপরাহ্ন ঘ ৫।১৩ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শুদ্রবর্ণ। **মৃতে**– একপাদদোষ, দিবা ঘ ১১।২৩ গতে ত্রিপাদদোষ। **যোগিনী**– ঈশানে, দিবা ঘ ৬।৩২ পূর্ব্বে শেষরাত্রি ঘ ৫।১১ গতে উত্তরে। **বারবেলাদি** ঘ ১০।৬ গতে ১।২১ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১।৬ গতে ২।২৮ মধ্যে। **যাত্রা**-- নাই। **শুভকর্ম্ম**-- দীক্ষা। **বিবিধ**– নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **ত্র্যহস্পর্শ। সন্নানদানে সহস্রগুণ ফল।** দিবা ঘ ৬।৩২ মধ্যে **মন্বন্তরা স্নানদানাদি ও অনধ্যায়।** দিবা ঘ ৬।৩২ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। **মাহেন্দ্রযোগ**– দিবা ঘ ৫।৫৮ মধ্যে ও ১।২ গতে ১।৫৫ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৩ গতে ৭।৪৬ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।৫৬ মধ্যে। **অমৃতযোগ**-- দিবা ঘ ৫।৫৮ গতে ৯।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৪৬ গতে ৯।১২ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৯ শ্রাবণ, ভাঃ ১৪ শ্রাবণ, **৫ আগষ্ট,** ২২ জিল্কদ, ১৯ শাওন, উঃ ৫/১১, অঃ ৬/১৩, রবিবার, অষ্টমী দি ঘ ৬/৩০ পরে নবমী শেষ রা ঘ ৫/০৯, সেহ্‌রী শেষ ৩/৪২, ইফ্‌তার ৬/২০।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

প্রতিভাবান কবি শাহাদাৎ হোসেন এখন বিস্মৃতির অন্তরালে

সেখ হাসান ইমাম

রবীন্দ্রযুগের বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে শাহাদৎ হোসেন প্রতিনিধিস্থানীয়। ওপার বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক আঃ মান্নান সৈয়দ বলেছেন, 'কবি শাহাদাৎ হোসেন প্রথম বাঙালি মুসলিম বিশুদ্ধ কবি, কবিতাকে তিনি সমাজে, ধর্ম ও রাজনীতির খপ্পর থেকে মুক্ত করে তার নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছিলেন।' বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক শাহাবুদ্দিন আহমদ-এর মন্তব্য, ‘‘কবি আব্দুল কাদিরের মতে, 'গোলাম মোস্তফা রবীন্দ্রযুগের প্রথম সার্থক মুসলমান কবি।' কবি আব্দুল কাদিরের এই অভিমত যথার্থ বলে শাহাদৎ হোসেনকে দ্বিতীয় সার্থক কবি বলা যেতে পারে।” এপার বাংলার খ্যাতিমান নজরুল গবেষক ও সাহিত্য-সমীক্ষক আজহারুদ্দিন খান-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, 'শাহাদৎ হোসেন রবীন্দ্রযুগের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর নামোল্লেখ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। শাহাদাৎ হোসেনের আদর্শনিষ্ঠ সংযমশীল দৃষ্টিভঙ্গি আপেক্ষিক অসাফল্য সত্ত্বেও মর্মাদায় অধিষ্ঠিত হবার দাবি রাখে।'

কবির জন্ম ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ২৪ পরগনা জেলার বারাসত মহকুমার অধীন দেগঙ্গা থানার পণ্ডিতপোল গ্রামে। কবির পিতার নাম বাহারউদ্দিন আহমদ্। স্কুলে লেখাপড়া শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করেননি কবিতায় পাওয়া দুরন্ত কিশোর। অদৃষ্ট-নিয়ন্তা বোধ হয় আড়ালে হেসেছিলেন। স্কুলের শিক্ষা শেষ করেননি যিনি, তাঁকে প্রথম জীবনে বৃত্তি হিসেবে বেছে নিতে হল শিক্ষকতাকে। পরে তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। এরপর থেকেই সংবাদিকতা জগতের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কিছুকাল 'সওগাত' সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন এবং 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী', 'একাল ও সহচর'-এর সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। 'দৈনিক সুলতান', 'সাপ্তাহিক মোসলেম জগৎ' ও 'সাপ্তাহিক খাদেম' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত তিন ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং রেডিয়ো পাকিস্তানের পাক্ষিক বাংলা অনুষ্ঠান পত্রিকার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। দীর্ঘ পত্রিকা সম্পাদনাকালে কবি অনলসভাবে সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। মূলত কবি হলেও তাঁর লেখনী অনেক গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও শিশুসাহিত্যের জন্ম দিয়েছে।

সাহিত্যচর্চার ফাঁকে ফাঁকে কবি দেশসেবা করেছেন, অংশ নিয়েছেন অভিনয়ে। ১৯৩১ সালে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। মীর্জাপুর পার্কে বক্তৃতা প্রদানকালে কবিকে গ্রেপ্তার করে কারান্তরালে পাঠানো হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, শিশির কুমার ভাদুড়ি প্রমুখ নাট্যাচার্যের সংস্পর্শে এসে শাহাদাৎ হোসেন অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। শিশির কুমার নাট্যমন্দির-এ তিনি কিছুকাল অভিনয় করেন।

শাহাদাৎ হোসেন লিখেছেন বেশকিছু গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ। কিন্তু তিনি মূলত কবি। শাহাবুদ্দিন আহমদের মতে, 'শাহাদাৎ হোসেন মূলত রবীন্দ্রানুসারী কবি এবং রবীন্দ্রপন্থী, রবীন্দ্রবলয়ের কবি। তাঁর সৃষ্টিতত্ত্বমূলক এবং প্রেমেও প্রকৃত বিষয়ক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রবল। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রচরিত্রের কবি নন। রবীন্দ্রনাথের স্থৈর্য, প্রশান্তির বদলে তাঁর কবিতায় আছে ক্ষোভ, আক্ষেপ এবং হতাশা। আজাহারুদ্দিন খানের মতে, 'শাহাদাৎ হোসেন কবিগুরুর সমগ্র ঐতিহ্যের অনুসারী ছিলেন না— যেখানে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য সুষমায় মর্ত্যজীবনকে আপন মনের মাধুরী রচনা করেছেন, দৃশ্য জগতের মধ্যে অদৃশ্য জগতের অনুভূতি আরোপ করেছেন, সেখানেই শাহাদাৎ হোসেনের কবিকল্পনা ছিল রোমান্টিক রস সমৃদ্ধ। তাঁর কবিতায় আছে কল্পনা-বিলাসের প্রাবল্য। গৌরবোজ্জ্বল অতীত, মর্ত্যজীবনের সৌন্দর্য প্রেম, প্রকৃতি প্রভৃতি যেখানে রোমান্সরস বিস্তারের সবিশেষ সুযোগ আছে, শাহাদাৎ হোসেনের কবিতায় একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে। এদিক থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথ নন, মোহিতলাল এবং নজরুলের দ্বারাও প্রভাবিত। প্রকৃতি বর্ণনায় মোহিতলালের বৈশিষ্ট্য হল তীক্ষ্ণ সৌন্দার্যানুভূতি। তাঁর কালবৈশাখী কবিতায় মোহিতলাল প্রকৃতির যে রূপ অঙ্কন করেছেন, শাহাদাৎ হোসেনের ঋতু সন্ন্যাসী-তে তার প্রভাব স্পষ্ট। 'সিন্ধু তৃতীয় তরঙ্গ' কবিতায় নজরুলের বিরহী প্রাণের যে সুতীব্র জ্বালা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কল্প লেখায় শাহাদাৎ হোসেন তার প্রভাব এড়াতে পারেননি। তাঁর 'শহীদে কারবালা' নজরুলের 'খেয়াপারের তরুণী' ও 'মহরম' কবিতার অনুকরণে লিখিত। একইভাবে রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' তাঁকে 'নূরজাহান' রচনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল, যদিও উভয়ক্ষেত্রেই তাঁর অনুকরণ দুর্বল। তাই বলা যায়, রোমান্টিক কবি-চেতনায় তিনি রবীন্দ্র-মোহিতলাল-নজরুল প্রমুখ কবিদের দ্বারা সু-স্পষ্টভাবে প্রভাবিত। আবার শব্দ বিন্যাস, বাকভঙ্গি ও রচনারীতিতে তিনি মধু-হেম-নবীনের অনুসারী। 'এই দুয়ের সমন্বয়ে তাঁর কবিতার আত্মা ও শরীর গড়ে উঠেছে।'

শাহাদাৎ হোসেনেল উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'রূপচ্ছন্দা'। এতে বিভিন্ন ধরনের কবিতা আছে। দ্বিতীয় অংশের কবিতাগুলি সমাজ-জাগরণমূলক। এই সমস্ত কবিতায় শাহাদাৎ হোসেনের মূলত ইসলামি আদর্শের কবি, মুসলিম জাতীয়তাবাদী কবি। 'রমজান', 'কোরবানী', 'শওয়ালের চাঁদ', 'মরু-সঞ্জীবনী' প্রভৃতি এই বক্তব্যে যথার্থ প্রমাণ করে। কবি নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। ইসলামের সাম্য ও বিশ্বভাতৃত্বের আদর্শ তাঁকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। এ বিষয়ে তাঁর ঈদ-উল-ফিতর কবিতাটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই কবিতার কয়েকটি পঙক্তি ঃ

‘‘সাম্যের দিশারী আমি আমি মুসলমান/দেশ-কাল-পাত্রে মোর সব একাকার/বহুত্বে একক আমি আত্মার আত্মীয় মোর দুনিয়া জাহান।”

বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়েও শাহাদাৎ হোসেন মুসলিম জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে কুণ্ঠিত হননি। এ বিষয়ে তিনি কাজী আব্দুল ওদুদ অপেক্ষা স্যার মহঃ ইকবালের অনুসারী। তাই 'সিরাজের স্বপ্ন' কবিতায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের জয়গান গেয়েও তিনি যৌবনের প্যান-ইসলামিক আদর্শকে বিসর্জন দিতে পারেননি। আর তা পারেন নি বলেই পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। 'হে পাক পাকিস্তান', 'জিন্দা পাকিস্তান', 'যুগপথিক' ও 'বিদায় তসলিম' এই ধারার উল্লেখযোগ্য কবিতা।

শাবাদাৎ হোসেনের অভিনয় দক্ষতা ছিল এবং প্রখ্যাত নট শিশির কুমার ভাদুড়ি তাঁকে নাট্যমন্দিরে অভিনয়ের সুযোগ করে দেন। কবি চরিত্রের এই অভিনয়-প্রবণতা তাঁর শিল্পসৃষ্টিকেও প্রভাবিত করেছিল। 'নাটকীয় আকস্মিতা' তাঁর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'সরফরাজ খাঁ' নামে একখানি নাটকও তিনি রচনা করেন এবং 'মরুর কুসুম' ও 'সোনার কাঁকন' উপন্যাস দুখানিকে যথাক্রমে 'আনারকলি' ও 'মসনদের মোহ' নামে নাট্যরূপ প্রদান করেন। তাঁর বেশকিছু কবিতা নাট্যগুণ সমৃদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ 'শাহজানের মৃত্যু স্বপ্ন', 'জাহাঙ্গীরের আত্মসমর্পণ', 'সিরাজের স্বপ্ন', 'কোরবানী' প্রভৃতি কবিতায় নামোল্লেখ করতে হয়। কবিতাগুলি পাঠ করার সময় রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' এবং 'কচ ও দেবযানী'র কথা স্বতঃই সতর্ক পাঠকের মনে উদিত হয়ে থাকে। যদিও ছন্দের প্রয়োগে তিনি রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার সাহস দেখিয়েছেন অমিত্রাক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে। উল্লিখিত কবিতাগুলিকে শাহাদাৎ হোসেনের কবিপ্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষণীয়। এই সব কবিতায় তিনি প্রশংসনীয়ভাবে সংযম ও পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ভাব ও ভাষার সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে যে শৈথিল্য অন্যত্র মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়, এখানে তা অনুপস্থিত। এখানে তিনি প্রকৃত শিল্পীর ভাব-গাম্ভীর্য, মননশীলতা, বৈদগ্ধ্য ও সংযম নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। এছাড়া তাঁর কবি প্রতিভার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ (১) আজীবন একই ধারার অনুসারী। (২) সৌন্দর্যানুভূতির উপাসক। (৩) শব্দকুশলী, (৪) যুগ যন্ত্রণার হ্রস্ব উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি, (৫) অন্তর্মুখিনতা।

সমালোচক আজহারউদ্দিন খান মন্তব্য করেছেন, 'প্রথম শ্রেণির কবির মর্যাদা শাহাদাৎ হোসেনের প্রাপ্য নয়। কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জনের মতো তিনি দ্বিতীয় শ্রেণির কবি।' আমরা কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করি। আমাদের মতে, প্রথম শ্রেণির কবি প্রতিভা নিয়েই সাহিত্যক্ষেত্রে শাহাদাৎ হোসেনের আবির্ভাব। প্রথম শ্রেণির প্রতিভা থাকলেই যে সব সময় সফল হওয়া যাবে, তার কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কাজী নজরুল ইসলাম ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কোন্ শ্রেণির কবি? নিশ্চয় প্রথম শ্রেণির কবি। কিন্তু এঁরাও শাহাদাৎ হোসেন-সুলভ ত্রূটিমুক্ত নন। বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস, বল্গাহীন কল্পনাবিলাস, আপন সৃষ্টি সম্পর্কে অসতর্কতা নজরুলের মতো শাহাদাৎ হোসেনও বিদ্যমান। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নজরুল প্রথম শ্রেণির কবি। সত্যেন্দ্রনাথের সেকালের গুণগুলোই এখন দোষের পর্যায়ে এসে গেছে। ছন্দ নিয়ে তাঁর অত্যন্ত যান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অতিকথন প্রবণতা, অগভীর বিশ্লেষণ ইত্যাদি তাঁর জনপ্রিয়তার ব্যারোমিটারের পারদকে অতিদ্রুত নীচে নামিয়ে এনেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রাথের প্রথম শ্রেণির কবির মর্যাদা প্রাপ্য। শাহাদাৎ হোসেন সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রতিভাবান কবি হয়েও নিজের প্রতিভার ওপর যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণ না থাকায় সুবিপুল সিদ্ধিলাভ তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। তা সত্ত্বেও শাহাদাৎ হোসেন প্রথম শ্রেণির কবি হিসেবে গণ্য হওয়ার দাবিদার। আব্দুল মান্নান সৈয়দ ঠিকই বলেছেন যে, কবিতাকে তিনি সমাজধর্ম ও রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত করে তাঁর নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃত করেই এই আলোচনা শেষ করছি, 'তাঁর অস্থির ও বহুধর্মী দরিদ্র কিন্তু শিল্পীশোভন অহংকারী ও এলোমেলো জীবনযাপন তাঁকে অনেক পথ ছুটিয়েছে বটে, কিন্তু একথাও জানিয়ে দিয়েছে যে, তাঁর ধমনীর ভিতরে আছে কবিতার ধ্বনি, রক্তের ভিতর আছে কবিতার শব্দ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে পূণ্যধাম কামারপুকুর

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

পর্ব ১

১। প্রাসঙ্গিক কথন

শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন 'ভাবরাজ্যের সম্রাট'। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের অন্যতম শরিক তথা স্থপতি স্বামী সারদানন্দজী (শরৎ মহারাজ) এই আখ্যা দিয়ে গেছেন। অনন্ত ভাবময় পরমপুরুষ তিনি। তাই তাঁর ভাবের ইতি করা যায় না। তিনি সকল ভাবের প্রতিমূর্তি। কোন ভাবকেই তিনি অগ্রাহ্য করেন নি। যত রকমে ভাব আছে—শ্রীরামকৃষ্ণ তার নিয়ন্তা, তার অন্তিম পরাকাষ্ঠাও তিনি। তাঁর মধ্যে কত অদ্ভুত ভাবের সমন্বয়। আসল কথা, ভগবানের ভাবের কখনো ইতি করা যায় না। 'তিনি এই পর্যন্ত হতে পারেন, আর কিছু হতে পারেন না।'— এই রকমটা বলা যায় না। তাঁর ভাব অনন্ত, কেউ তার সীমা করতে পারে না। তাঁরই ভাবের আধার হয়ে উঠেছিলেন শ্রীমা স্বয়ং এবং তাঁর ভাবপ্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসী ও গৃহীরা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও আদর্শকে জগতে প্রচার করতে হয়নি। তাঁর আদর্শ স্বয়ং নিজেই। তিনি নিজেই বলেছেন, ‘‘বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা যিনি, তিনি মানুষের ভেতর চোদ্দ-পোয়া মানুষ হয়ে আছেন।” তিনি আরেকটি কথা বলেছন, ‘‘আমি ছাঁচ তেরি করে রেখে গেলাম, তোরা আগুন পুইয়ে নে, আমি রান্না করে রেখে গেলাম, তোরা বাড়া ভাতে বসে যা।” তাঁর কথা দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি ছাঁচ গড়ে দিয়ে গেছেন, তাতে ফেলে নিজেদের গড়ে নিতে হবে— এটাই আসল কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ যে আধ্যাত্মিকতার কথা বলে গেছেন, আজ তা বিশ্বমনে জায়গা করে নিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণভাবের ধর্মজীবন সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে শুদ্ধ, সবচেয়ে নিরাপদও বটে। আর সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ হল— আন্তরিকভাবে জপ-ধ্যান করা, সমস্ত কাজ পূজা ও সেবার বুদ্ধিতে করা, সম্পূর্ণ পবিত্র ও নীতিপরায়ণ থাকা এবং প্রতিদিন ভগবান ও মানুষকে ভালোবাসতে চেষ্টা করা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ঢেউ আজ সমগ্র বিশ্বজুড়ে প্রতিটি ঘরের দরজায় আছড়ে পড়েছে। যতই দিন যাচ্ছে, তাঁর ভাবধারা অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলন ততই জোরদার হয়ে উঠছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের এই যে বিশাল বিস্তৃতি, এজন্য শ্রীমায়ের অবদানকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। স্বামী ভূতেশানন্দজী বলেছেন, ‘‘শ্রীরামকৃষ্ণ- ভাবান্দোলনে শ্রীরামকৃষ্ণের যদি কোন অবদান থাকে, তবে সে সবই শ্রীমায়ের অবদান। আমরা বলি, মা আর ঠাকুর আলাদা নন। এই কথাগুলি শুধু কেবল ভাবের দৃষ্টিতে বিচার করে বলার কথা নয়।”[1] সত্যিটা হল, আজ সর্বত্রই তাঁদের প্রভায় আলোকিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব একশ তিরাশি পূর্ণ হতে চলল। অখ্যাত গ্রাম কামারপুকুরের এক পর্ণকুটিরে শ্রীরামকৃষ্ণ আজ বিশ্বকুটিরের শ্রীরামকৃষ্ণরূপে বন্দিত। সেই প্রত্যন্ত গ্রাম কামারপুকুর তাঁর জন্মস্থল, সেখানে না ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা, না ছিল শিক্ষার পরিবেশ। গ্রামে গরিষ্ঠ সংখ্যক দরিদ্র মানুষের বসবাস। বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অগণিত নিরক্ষর-দরিদ্র মানুষেরই একজন। অথচ তাঁর মস্তিষ্কে ছিল অপরিমেয় মেধা আর অন্তরে ছিল ঈশ্বরীয় ভবতন্ময়তা। এই দুইয়ের সম্মিলনে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন আগাগোড়া স্বতন্ত্র ও অনন্য। তাঁর এই অনন্যতা স্মরণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা আজ জগৎজুড়ে বিস্তারিত, সপ্তসমুদ্রে প্রবাহিত। তাঁর ভাবাদর্শ একালের মানুষের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে বিভিন্নভাবে। স্বামী প্রভানন্দজী লিখেছেন, ‘‘জগৎজুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর সঙ্গে সম্বন্ধ সবচেয়ে জনপ্রিয় ভাবাদর্শটি হচ্ছে ধর্মসমন্বয় তথা সর্বধর্মসমন্বয়।”[2] শ্রীরামকৃষ্ণ দেশীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যানুসারী যা কল্যাণকর নিজ জীবনাচরণে যেমন প্রকটিত করে গেছেন, তেমনি নিষ্ঠা, সততা, অধ্যবসায়, উদারতা, ধর্মাচরণ, সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের প্রক্ষিণ দিয়ে গেছেন। সবটা না হলেও আমরা সে সব গ্রহণ করার চেষ্টা করছি মাত্র।

২। অতীতের গ্রামখানি

এখনকার কামারপুকুর আর তখনকার কামারপুকুরের মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। শ্রীরামকৃষ্ণের আমলে কিছুকাল এই আরামবাগ (জাহানাবাদ) মহকুমা বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ছিল। পরে হুগলি জেলার অন্তর্ভূক্ত হয়।

সম্পাদক সমীপেষু

তুমি তোমাকে দেখ

স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরম হংসদেব বলেছিলেন, যত মত তত পথ। অর্থাৎ যত মতামত প্রকাশ করবেন, তত নতুন নতুন পথের সন্ধান পেয়ে যাবেন। একটা মতামত দেবার আগে হাজার বার ভেবে দেখুন, আপনার, আমার ও আমাদের সেই মতামতটা মানুষ সঠিকভাবে গ্রহণ করেছে কিনা। যদি গ্রহণ না করে,তবে অহেতুক মতামত পোষণ করাটা সঠিক হবে না। আমাদের মতামতটা যদি সঠিক না হয়, তবে সেটা মানুষ গ্রহণ করবে না। যার জন্য অহেতুক মতামত দিয়ে যদি বিতর্কের মধ্যে আমরা পড়ে যাই, সেই মতামতের কথা ভেবেই একটা সমাধানের পথ পাওয়া যেতে পারে। আর সমস্যায় থাকা সেই কাজটাকে সমাধানের পথে এনে নতুন আলো জ্বেলে দেয়। তাই যত রকমের মতামত থাকে, তত রকমের পথের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কারণ আয়না একই রকমভাবে থেকে যায়। শুধুমাত্র শরীরটার পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। অপরের বিচার করার আগে তুমি তোমাকে আগে দেখ, তুমি ঠিকভাবে কতখানি মানুষের পাশে থেকে বন্ধুত্বের হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিলে। মানুষের পাশে থেকে সত্যিই কী মানুষের নাম করেছিলে, সেটা একবার বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে দেখতো। বিবেক তোমাকে সব কথার উত্তরটা দিয়ে দেবে। হাতজোড় করা মানে নিজেকে ছোট বা হেয় করা হয় না। তবে অনেক সময় হাত জোড় করেও বোধ হয় লাভ হয় না। সারাবছর ধরে মানুষের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে যদি একটা দীর্ঘ পথ চলার অঙ্গীকার করা যায়, তবেই হাত জোড় করাটা সফল হয়। যদি কোনো কিছু হারিয়ে যায়, তখন কীভাবে খোঁজার তাগিদ থাকে সেটা তো নিশ্চয় জানা আছে। সেই জানাটাকে মানুষের পাশে থেকে জেনে নেওয়া আরো ভালো হয়। তাহলে বেশি করে খোঁজার প্রয়োজন হয় না। আমাকে ভাবতে হবে, কেন আমার প্রতি মানুষ আজ মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। কেন আমাকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না। অথচ কোনো একজন মানুষ যা বলছেন, তার কথাই বিশ্বাস করে যাচ্ছেন। এখানে তিনি বলছেন, আমাকে দেখার কোনো প্রযোজন নেই, আপনারা নিজেকে আগে দেখুন। মানুষের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তুলুন। মানুষের বন্ধু হবার জন্য নিজেকে আগে এগিয়ে নিয়ে যান। তবেই বুঝতে পারবেন মানুষের মনের কথাগুলো। এই কারণেই সবার আগে তুমি তোমাকে দেখ মনের আয়নায়। সেখানেই সব উত্তরটা হয়তো পাওয়া যাবে। তখন আর অভিমান করে বলতে হবে না— ভালো করে চেয়ে দেখ/দেখতো চিনতে পারো কিনা!

বিবেক রায়দে
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়